দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 25 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষকের পাশে সমাজকেই দাঁড়াতে হবে

আবুল মোমেন

ওসমান ভ্রাতার পরোয়া নেই, তিনি তার কৃতকর্মের পক্ষে জোরগলায় সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। তার পক্ষে ধুয়া তোলার মানুষেরও তো অভাব নেই। এর মধ্যে ক্ষীণ আশার রেখা হয়ে ওঠে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর কঠোর বক্তব্যে

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জাগরণের মাধ্যমে সমাজে যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, তা ছিল চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির আলোকে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ। এ ধারাতেই একাত্তরে বাংলাদেশের জন্ম। এরই ধারাবাহিকতায় জয় বাংলা স্লোগান বুকে ধারণ করে যুদ্ধ করেছে বাঙালি। সব আবেগ ঢেলে দিয়ে কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল যেসব গান তার মূল সুর– 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এবং 'মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি।' আমাদের জাতীয় সংগীতের প্রথম আর শেষ চরণ দুটি মানুষের ভাবাবেগকে সঠিকভাবে ধারণ করে থাকে। একাত্তরের যুদ্ধে বড় পোস্টারে লেখা ছিল– 'বাংলার মুসলিম, বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান'। এ যুদ্ধে যেমন সব ধর্মের মানুষ অংশ নিয়েছে, শহীদ হয়েছে; তেমনি সবাই দেশটিকে আপন করে নিয়েছিল। যখন দেশ স্বাধীন হয় তখনো এ দেশে সব ধর্মের সংখ্যালঘুর সংখ্যা প্রায় জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ, যার মধ্যে হিন্দুই ছিল প্রধান।

৪৫ বছর পর আজ বাস্তবতা কী? সংবিধান বলছে এ রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম, অর্থাৎ এটি মূলত মুসলমানদের দেশ। পঁচাত্তরের পর থেকেই পেছন দিকে যাত্রা শুরু হয়েছিল দেশের। রাষ্ট্র পাকিস্তানের মতোই সংখ্যালঘুর প্রতি, বিশেষত হিন্দুদের প্রতি, বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে। চাকরিপ্রাপ্তি, পদোন্নতি, ব্যাংকঋণ প্রাপ্তি, জমি বিক্রি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে ঠিক পাকিস্তানের মতোই হিন্দু বঞ্চিত হয়েছে, বৈষম্যের শিকার হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের এ ধারাটা এরপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত আর বন্ধ হয়নি। কিন্তু ইত্যবসরে ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় যাদের পরিমাণ ছিল জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ, আর ১৯৭২-এ ১৭-১৮ শতাংশ, তাদের সংখ্যা নেমে গেল মাত্র ৯ শতাংশে।

এর ওপর ইতোমধ্যে জনমানসে যেন অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। যে মানুষ একবার শোষণে অভ্যস্ত হয়, সম্পন্ন কাউকে দুর্বল জেনে তার বা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য বঞ্চিত করে সে সেই অভ্যাস আর ছাড়তে পারে না। এর মধ্যে সামরিক স্বৈরশাসকের রাজনীতির অঙ্গনে জবরদস্তি নেতৃত্ব গ্রহণ ও তা ধরে রাখার প্রবণতার উপজাত হিসেবে রাজনীতিতে জবরদস্তি খাটানোর ধারা সৃষ্টি হয়ে গেছে। ক্রমাগত একতরফা মার খেয়ে আওয়ামী লীগ এদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার কৌশল নিতে বাধ্য হয়েছে। এ সময় দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল দল আওয়ামী লীগের মধ্যেও দুটি পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশের গণমানুষের দল হিসেবে এটি বরাবর ছিল মুসলিমপ্রধান দল, তবে প্রধানত দেশের সাধারণ ধর্মভীরু মুসলমানের সমর্থনের সঙ্গে দলের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কারণে দেশের সংখ্যালঘুদের সমর্থনও পেয়ে এসেছে। এ কারণে দলটিকে ধর্মহীনতার দায়ে অভিযুক্ত করে এবং ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে ভারতঘেঁষা দল হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রতিপক্ষ দল মুসলিম ভোটারদের বরাবর বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এসেছে। এ দুটিই পাকিস্তানি রাজনীতির কৌশল বা অপকৌশল, বিএনপি, জামায়াত ও জাপা সেটিই প্রয়োগ করেছে বারবার।

আওয়ামী লীগ এসব সমালোচনা কাটানোর জন্য কার্যকর প্রতিষেধক হিসেবে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার শুরু করেছে, ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছে, এমনকি হেফাজতের মতো জ্ঞানচর্চার মুক্ত বাতাবরণের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গেও আপস-তোয়াজের পথ ধরেছে। পাশাপাশি প্রতিপক্ষ দলের মাস্তান-গুন্ডা বাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে গিয়ে নব্য ধনীনির্ভর গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির ফাঁদে পা দিতেও কসুর করেনি। আজ সব বড় দলের যোগসাজশে জাতীয় রাজনীতিতে পেশিশক্তি এবং তার অনুগামী হয়ে কালোটাকা ও অবৈধ অস্ত্র অবাধে প্রচলিত হয়ে গেছে। এতকাল মাঠপর্যায়ে জনমানুষের আপনজন যেসব রাজনীতিবিদ সক্রিয় ছিলেন, তারা এ ধারায় অকেজো, তাই আওয়ামী লীগের মতো দলেও ক্রমে বাইরে ছিটকে পড়েছেন। যুগপৎ বিত্তবান-ক্ষমতাবান একটি শ্রেণি আজ সব এলাকায় দলীয় রাজনীতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বনে গেছে। তাদের চ্যালাচামুণ্ডাও থাকে, তোষামুদের দলও থাকে। এদের কাছে ক্ষমতা ও বিত্তই সব, আদর্শ, দেশপ্রেম, জনকল্যাণ, নারী-শিশুর প্রতি সংবেদনশীলতা, পরিবেশ বা জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয়ই নয়। দুর্বলের সম্পত্তির দিকে এদের নজর, ভোগ-দখলের আরও যা ক্ষেত্র থাকে কোনোটিই বাদ যায় না। ধর্মসহ সবকিছুই তাদের কাছে আখের গোছানোর অবলম্বন, ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করার ও বিনিয়োগের বিষয়।

বলা বাহুল্য, এই উচ্চাভিলাষী নব্য ধনী, নব্য রাজনীতিবিদরা নানা দলে বিভক্ত থাকলেও সেটা নিতান্ত কাকতালীয় বাহ্য ব্যাপার, আসল কাজে– অর্থাৎ ক্ষমতা ও বিত্তের সম্প্রসারণে ও মহড়া চালানোয় সবাই সমান। এভাবে এ দেশে এখন সংখ্যালঘু হিন্দুর সংখ্যা ৯ শতাংশে নেমে গেছে, এখন খ্রিস্টান-বৌদ্ধরাও আক্রান্ত হচ্ছে, অসহায়ভাবে এই শ্রেণির দখলদারির শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘু আদিবাসীরা। এই প্রান্তিক মানুষগুলোকেও দেশ ছাড়ার কথা ভাবতে হয় আজ। এতে বাঙালি সমাজের হাজার বছরে গড়ে ওঠা উদার মানবিক সাংস্কৃতিক বাতাবরণ এবং বুনট তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। এটি যে বৈচিত্র্যময়সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দেশ তা আমরা ভুলতে বসেছি। হয়তো এই বিপথগামী সমাজ তৈরি করে নিচ্ছে তার নতুন নায়কদের।

হ্যাঁ, এই নব্য মহাপুরুষদেরই প্রতিনিধি সেলিম ওসমান। নারায়ণগঞ্জের ওসমান ভ্রাতাদের এ ভ্রাতাটির সর্বশেষ কীর্তি ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছে, সমাজ বহুকাল পর বিবেকের তাড়নায় প্রতিবাদী হয়েছে। তাতে অবশ্য ওসমান ভ্রাতার পরোয়া নেই, তিনি তার কৃতকর্মের পক্ষে জোরগলায় সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। তার পক্ষে ধুয়া তোলার মানুষেরও তো অভাব নেই। এর মধ্যে ক্ষীণ আশার রেখা হয়ে ওঠে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর কঠোর বক্তব্যে। সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থিন যোগাযোগমন্ত্রীর জোরালো সমালোচনা ও প্রতিবিধানের প্রত্যয়ে ভরসা পেয়েছিলেন অনেকে। আমরা কি ভাবতে পারি? – না, দিন বদলাবে বোধহয়। সত্যি বলতে কি, আমরা এই ভরসা হারাতে চাই না।

শুধু এটুকু আশা করব, ভিকটিমকেই যা করার করতে হবে সেই অগ্নিপরীক্ষায় আশা করি চরম হেনস্তার শিকার সংখ্যালঘু নীতিবাদী প্রধান শিক্ষক মানুষটিকে ঠেলে দেওয়া হবে না।

এ ক্ষেত্রে আমরা আদালতের মতো সরকারের কাছ থেকেও স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ চাই। চাই এমন সাংসদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ